

# কাবুলিওয়ালা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



আমার পাঁচ বছর বয়সের ছোটো মেয়ে মিনি এক দণ্ড কথা না কহিয়া থাকিতে পারে না।

সকালবেলায় আমার নভেলের সপ্তদশ পরিচ্ছেদে হাত দিয়াছি এমন সময় মিনি আসিয়াই আরম্ভ করিয়া দিল, “বাবা, রামদয়াল দরোয়ান কাককে কৌয়া বলছিল, সে কিচু জানে না। না?”

সে আমার লিখিবার টেবিলের পার্শ্বে আমার পায়ের কাছে বসিয়া নিজের দুই হাঁটু এবং হাত লইয়া অতিদ্রুত উচ্চারণে আগডুম-বাগডুম খেলিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

আমার ঘর পথের ধারে। হঠাৎ মিনি আগডুম-বাগডুম খেলা রাখিয়া জানালার ধারে ছুটিয়া গেল এবং চিৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, “কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা।”

ফর্ম-১, ৭ম শ্রেণি (সপ্তবর্গ)

ময়লা ঢিলা কাপড় পরা, পাগড়ি মাথায়, ঝুলি ঘাড়ে, হাতে গোটা দুই-চার আঙুরের বাজ, এক লম্বা কাবুলিওয়ালা পথ দিয়া যাইতেছিল— তাহাকে দেখিয়া আমার কন্যারত্নের কিরূপ ভাবোদয় হইল বলা শক্ত, তাহাকে উর্ধ্বশ্বাসে ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়া দিল।

মিনির চিৎকারে যেমনি কাবুলিওয়ালা হাসিয়া মুখ ফিরাইল এবং আমাদের বাড়ির দিকে আসিতে লাগিল, অমনি সে উর্ধ্বশ্বাসে অন্তঃপুরে দৌড় দিল, তাহার আর চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল না। তাহার মনের মধ্যে একটা অন্ধ বিশ্বাসের মতো ছিল যে, ঐ ঝুলিটার ভিতর সন্ধান করিলে তাহার মতো দুটো-চারটে জীবিত মানবসন্তান পাওয়া যাইতে পারে।

আমি মিনির অমূলক ভয় ভাঙাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে অন্তঃপুর হইতে ডাকাইয়া আনিলাম— সে আমার গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কাবুলি ঝুলির মধ্য হইতে কিসমিস, খোবানি বাহির করিয়া তাহাকে দিতে গেল, সে কিছুতেই লইল না, দ্বিগুণ সন্দেহের সহিত আমার হাঁটুর কাছে সংলগ্ন হইয়া রহিল। প্রথম পরিচয়টা এমনি ভাবে গেল।

কিছুদিন পরে একদিন সকালবেলায় বাড়ি হইতে বাহির হইবার সময় দেখি, আমার দুহিতাটি দ্বারের সমীপস্থ বেঞ্চির উপর বসিয়া অনর্গল কথা কহিয়া যাইতেছে এবং কাবুলিওয়ালা তাহার পদতলে বসিয়া সহাস্যমুখে শুনিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে নিজের মতামতও ব্যক্ত করিতেছে। মিনির পঞ্চবর্ষীয় জীবনের অভিজ্ঞতায় বাবা ছাড়া এমন ধৈর্যবান শ্রোতা সে কখনো পায় নাই। আবার দেখি, তাহার ক্ষুদ্র আঁচল বাদাম-কিসমিসে পরিপূর্ণ।

সংবাদ পাইলাম, কাবুলিওয়ালার সহিত মিনির এই যে দ্বিতীয় সাক্ষাৎ তাহা নহে, ইতোমধ্যে সে প্রায় প্রত্যহ আসিয়া পেস্তাবাদাম ঘুষ দিয়া মিনির ক্ষুদ্র হৃদয়টুকু অনেকটা অধিকার করিয়া লইয়াছে।

দেখিলাম, এই দুটি বন্ধুর মধ্যে গুটিকতক বাঁধা কথা এবং ঠাট্টা প্রচলিত আছে — যথা, রহমতকে দেখিবামাত্র আমার কন্যা হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিত, “কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা, তোমার ও ঝুলির ভিতর কী?” রহমত একটা অনাবশ্যক চন্দ্রবিন্দু যোগ করিয়া হাসিতে হাসিতে উত্তর করিত, “হাঁতি।”

উহাদের মধ্যে আরও-একটা কথা প্রচলিত ছিল। রহমত মিনিকে বলিত, “খোঁখী, তোমি সসুরবাড়ি কখনু যাবে না?”

কথাটার একটা কোনো জবাব না দিয়া চুপ করিয়া থাকা নিতান্ত তাহার স্বভাববিরুদ্ধ — সে উল্টিয়া জিজ্ঞাসা করিত, “তুমি শ্বশুরবাড়ি যাবে?”

রহমত কাল্পনিক শ্বশুরের প্রতি প্রকাণ্ড মোটা মুষ্টি আফালন করিয়া বলিত, “হামি সসুরকে মারবে।”

শুনিয়া মিনি শ্বশুর-নামক কোনো-এক অপরিচিত জীবের দূরবস্থা কল্পনা করিয়া অত্যন্ত হাসিত।

মিনির মা অত্যন্ত শক্তিত স্বভাবের লোক। রহমত কাবুলিওয়ালা সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নিঃসংশয় ছিলেন না।

তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার জন্য তিনি আমাকে বারবার অনুরোধ করিয়াছিলেন।

একদিন সকালে আমার ছোট ঘরে বসিয়া প্রফশিট সংশোধন করিতেছি। এমন সময় রাত্তায় ভারি একটা গোল শুনা গেল।

চাহিয়া দেখি, আমাদের রহমতকে দুই পাহারাওয়ালা বাঁধিয়া লইয়া আসিতেছে— তাহার পশ্চাতে কৌতূহলী ছেলের দল চলিয়াছে। আমি দ্বারের বাহিরে গিয়া পাহারাওয়ালাকে দাঁড় করাইলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্যাপারটা কী?

কিয়দংশ তাহার কাছে, কিয়দংশ রহমতের কাছে শুনিয়া জানিলাম যে, আমাদের প্রতিবেশী একজন লোক রামপুরী চাদরের জন্য রহমতের কাছে কিস্তি ধারিত— মিথ্যাপূর্বক সেই দেনা সে অস্বীকার করে এবং তাহাই লইয়া বচসা করিতে করিতে রহমত তাহাকে এক ছুরি বসাইয়া দিয়াছে।

রহমত সেই মিথ্যাবাদীর উদ্দেশে নানারূপ অশ্রাব্য গালি দিতেছে, এমন সময় ‘কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা’ করিয়া ডাকিতে ডাকিতে মিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

রহমতের মুখ মুহূর্তের মধ্যে কৌতুকহাস্যে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। মিনি একেবারেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি শ্বশুরবাড়ি যাবে?”

রহমত হাসিয়া কহিল, “সিখানেই যাচ্ছে।”

সাংঘাতিক আঘাত করার অপরাধে কয়েক বৎসর রহমতের কারাদণ্ড হইল।

তাহার কথা একপ্রকার ভুলিয়া গেলাম।

কত বৎসর কাটিয়া গেল। আমার ঘরে আজ রাত্রি শেষ হইতে-না-হইতে সানাই বাজিতেছে। আজ আমার মিনির বিবাহ।

আমি আমার লিখিবার ঘরে বসিয়া হিসাব দেখিতেছি, এমন সময় রহমত আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

আমি প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারিলাম না। তাহার সে ঝুলি নাই। তাহার সে লম্বা চুল নাই, তাহার শরীরে পূর্বের মতো সে তেজ নাই। অবশেষে তাহার হাসি দেখিয়া তাহাকে চিনিলাম।

কহিলাম, “কী রে রহমত, কবে আসিলি?”

সে কহিল, “কাল সন্ধ্যাবেলা জেল হইতে খালাস পাইয়াছি।”

আমার ইচ্ছা করিতে লাগিল, আজিকার এই শুভদিনে এ লোকটা এখান হইতে গেলেই ভালো হয়।

আমি তাহাকে কহিলাম, “আজ আমাদের বাড়িতে একটা কাজ আছে, আমি কিছু ব্যস্ত আছি, তুমি আজ যাও।”

কথাটা শুনিয়াই সে তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল, অবশেষে দরজার কাছে গিয়া একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, “খোঁখীকে একবার দেখিতে পাইব না?”

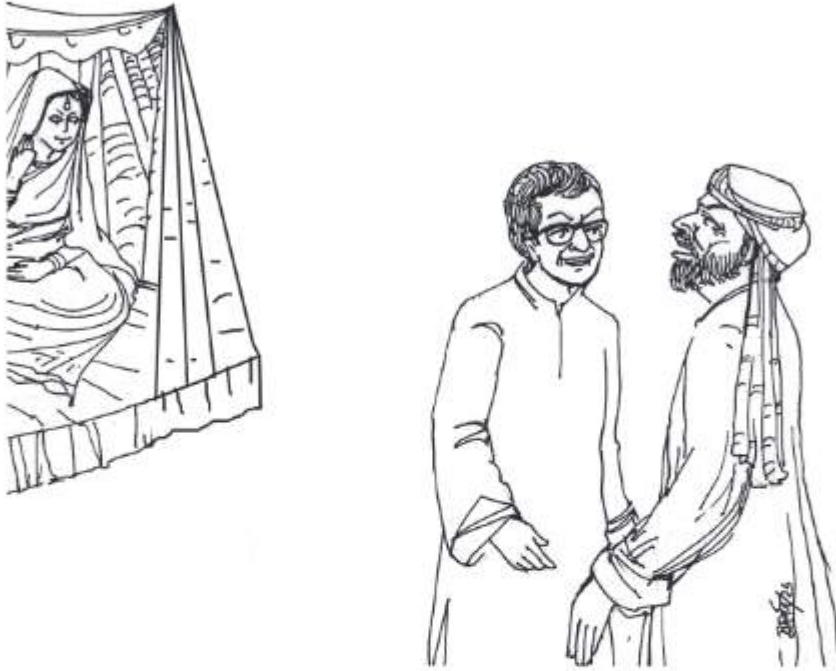
আমি কহিলাম, “আজ বাড়িতে কাজ আছে, আজ আর কাহারও সহিত দেখা হইতে পারিবে না।”

সে যেন কিছু ক্ষুণ্ণ হইল। গুরুভাবে দাঁড়াইয়া একবার স্থিরদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল, তারপরে ‘বাবু সেলাম’ বলিয়া দ্বারের বাহির হইয়া গেল।

আমার মনে কেমন একটু ব্যথা বোধ হইল। মনে করিতেছি তাহাকে ফিরিয়া ডাকিব, এমন সময়ে দেখি সে আপনি ফিরিয়া আসিতেছে।



কাছে আসিয়া কহিল, “এই আঙুর এবং কিঞ্চিৎ কিসমিস, বাদাম খোঁখীর জন্য অনিয়াছিলাম, তাহাকে দিবেন।” আমি সেগুলি লইয়া দাম দিতে উদ্যত হইলে সে হঠাৎ আমার হাত চাপিয়া ধরিল, কহিল, “আপনার বহুৎ দয়া, আমার চিরকাল স্মরণ থাকিবে — আমাকে পয়সা দিবেন না। বাবু, তোমার যেমন একটি লড়কি আছে, তেমনি



দেশে আমারও একটি লড়কি আছে। আমি তাহারই মুখখানি স্মরণ করিয়া তোমার খোঁখীর জন্য কিছু কিছু মেওয়া হাতে লইয়া আসি, আমি তো সওদা করিতে আসি না।”

এই বলিয়া সে আপনার মস্ত ঢিলা জামাটার ভিতর হাত ঢালাইয়া দিয়া বুকের কাছে কোথা হইতে একটুকরা ময়লা কাগজ বাহির করিল। বহু সযত্নে ভাঁজ খুলিয়া দুই হস্তে আমার টেবিলের উপর মেলিয়া ধরিল। দেখিলাম, কাগজের উপর একটি ছোট হাতের ছাপ। ফটোগ্রাফ নহে, তেলের ছবি নহে, হাতে খানিকটা ভুসা মাখাইয়া কাগজের উপরে তাহার চিহ্ন ধরিয়া লইয়াছে। কন্যার এই স্মরণচিহ্নটুকু বুকের কাছে লইয়া রহমত প্রতিবৎসর কলিকাতার রাস্তায় মেওয়া বেচিতে আসে।

দেখিয়া আমার চোখ ছলছল করিয়া আসিল। সেই হস্তচিহ্ন আমারই মনিকে স্মরণ করাইয়া দিল। আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে অন্তঃপুর হইতে ডাকাইয়া পাঠাইলাম। অন্তঃপুরে ইহাতে অনেক আপত্তি উঠিয়াছিল। কিন্তু আমি কিছুতে কর্ণপাত করিলাম না। রাঙাচেলি-পরা কপালে-চন্দন-আঁকা বধুবেশিনী মিনি সলজ্জভাবে আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

তাহাকে দেখিয়া কাবুলিওয়ালা প্রথমটা ধতমত খাইয়া গেল, তাহাদের পুরাতন আলাপ জমাইতে পারিল না। অবশেষে হাসিয়া কহিল, “খোঁখী, তোমি সসুরবাড়ি যাবিস?”

কাবুলিওয়ালার সহিত মিনির যেদিন প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আমার সেই দিনের কথা মনে পড়িল। মনটা কেমন ব্যথিত হইয়া উঠিল।

মিনি চলিয়া গেলে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রহমত মাটিতে বসিয়া পড়িল। সে হঠাৎ স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, তাহার মেয়েটিও ইতোমধ্যে এইরূপ বড় হইয়াছে।

আমি একখানি নোট লইয়া তাহাকে দিলাম। বলিলাম, “রহমত, তুমি দেশে তোমার মেয়ের কাছে ফিরিয়া যাও; তোমাদের মিলনসুখে আমার মিনির কল্যাণ হউক।”

(সংক্ষেপিত ও পরিমার্জিত)

### শব্দার্থ ও টীকা

দরোয়ান	— দারোয়ান শব্দের উচ্চারণভেদ।
কাবুল	— আফগানিস্তানের রাজধানী।
কাবুলিওয়াল	— কাবুলের অধিবাসী। অতীতে কাবুলের অনেক লোক নানা কাজে এ দেশে নিয়মিত যাতায়াত করত।
দণ্ড	— মুহূর্ত।
নভেল	— উপন্যাস।
সপ্তদশ	— সতেরো।
পরিচ্ছেদ	— অধ্যায়।
পার্শ্বে	— পাশে।
কন্যারত্ন	— কন্যাকে আদর করে রত্নের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।
ভাবোদয়	— ভাবের উদয়। মনে চিন্তা বা ভাবনা জাগা।
উর্ধ্বশ্বাসে	— অতি দ্রুতবেগে।
অন্তঃপুর	— বাড়ির ভিতরের অংশ।
অভিপ্রায়	— ইচ্ছা।
খোবানি	— বাদাম জাতীয় ফল।
দুহিতা	— কন্যা।
ঘর	— দরজা।
সমীপস্থ	— নিকটে, কাছে।
অনর্গল	— অবিরাম, অনবরত।
সহাস্যমুখ	— হাসিমুখ।
পঞ্চবর্ষীয়	— পাঁচ বছর বয়সী।
ক্ষুণ্ণশিট	— কোনো লেখা ছাপার আগে বানান, বাক্য, যতিচিহ্ন এসব সংশোধনের জন্য মুদ্রিত পত্র।
মেওয়া	— ডালিম, আঙ্গুর, বাদাম প্রভৃতি ফল। এ গল্পে খুকের জন্যে কাবুলিওয়ালার আনা এ জাতীয় উপহার।

খোঁষী	—	কাবুলিওয়ালা কর্তৃক 'খুকি' শব্দের অশুদ্ধ উচ্চারণ।
স্বভাববিরুদ্ধ	—	স্বভাবের বিপরীত।
মুষ্টি আক্ষালন	—	জোরে মুষ্টি নাড়িয়ে রাগ প্রকাশের ভঙ্গি।
নিঃসংশয়	—	শঙ্কাহীন।
কিষ্কিৎ	—	অল্প।
ধারিত	—	ঋণগ্রস্ত।
প্রফুল্ল	—	আনন্দিত।
লড়কি	—	মেয়ে।

### পাঠের উদ্দেশ্য

বাংলা ভাষার সাধু রীতির সাহিত্য পাঠে অনুপ্রাণিত করা।

### পাঠ-পরিচিতি

ভিন্ন সংস্কৃতিতে বেড়ে উঠলেও মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ ভালোবাসার অনুভূতি অনেকেই এক। 'কাবুলিওয়ালা' গল্পে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আফগানিস্তানের মরু পর্বতের রুক্ষ প্রকৃতিতে গড়ে ওঠা একজন পিতা এবং নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ার একজন বাঙালি পিতার ভিতরের স্নেহপ্রবণ মনের ঐক্য সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন। দেশকালের সীমারেখা পিতৃহৃদয়ের স্বাভাবিক প্রবণতায় কোনো প্রভাব বিস্তার করে না। যে দেশের, যে সময়ের বা যে সংস্কৃতিরই মানুষ হোক না কেন পিতা সব সময়ই তার সন্তানকে একই রকমভাবে ভালোবাসেন। সন্তানের মঙ্গলচিন্তা সব পিতারই সহজাত আকাঙ্ক্ষা। 'কাবুলিওয়ালা' গল্পে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বের সকল পিতার পিতৃত্বের সর্বজনীন ও চিরন্তন রূপ উন্মোচিত করেছেন।

### লেখক-পরিচিতি

এশীয়দের মধ্যে যিনি প্রথম নোবেল পুরস্কার পেয়ে বিশ্বসভায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি হলেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই মে (২৫শে বৈশাখ, ১২৬৮ বঙ্গাব্দ) কলকাতায় জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। স্কুলে নিয়মিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তাঁর হয়নি। সতেরো বছর বয়সে বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়েছিলেন; কিন্তু পড়া শেষ না হতেই দেশে ফিরে আসেন তিনি। কিন্তু স্বশিক্ষা ও সাধনার একক অবদানে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে এত সমৃদ্ধ করেছেন যার কোনো তুলনা নেই। কাব্য, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, সংগীত—সাহিত্যের সকল শাখা তাঁর আশ্চর্য অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছে। ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব, ছন্দ এবং চিত্রকলাতেও তিনি অসামান্য অবদান রেখেছেন।

অনন্যসাধারণ তাঁর প্রতিভা। তিনি একাধারে সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ, সুরকার, গীতিকার, নাট্যকার, নাট্যপ্রযোজক এবং অভিনেতা। শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীর মতো প্রতিষ্ঠান গড়ে তিনি শিক্ষায় নতুন ধারা সৃষ্টি করেছেন। রবীন্দ্রনাথের একটি দেশপ্রেমমূলক গান বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত। রবীন্দ্রনাথের লেখা

গ্রন্থের সংখ্যা অনেক। ছোটোদের জন্য লেখা তাঁর বিভিন্ন রচনা সংকলিত হয়েছে ‘কৈশোরক’ নামে একটি সংকলনে।

১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট (২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ) কলকাতায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

### কর্ম-অনুশীলন

ক. সাধু রীতিতে লেখা ১০টি গল্পের তালিকা তৈরি কর (একক কাজ)।

খ. পাঠ্য বইয়ের ১টি করে সাধু ও চলিত রীতির গদ্য অবলম্বনে রীতি দুটোর ৫টি পার্থক্য বের কর (দলীয় কাজ)।

গ. সাধু রীতির একটি অনুচ্ছেদ চলিত রীতিতে রূপান্তর কর।

### নমুনা প্রশ্ন

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ‘কাবুলিওয়ালা’ গল্পে শক্তির স্বভাবের মানুষটি কে?

- |             |               |
|-------------|---------------|
| ক. রহমত     | খ. মিনির মা   |
| গ. রামদয়াল | ঘ. মিনির বাবা |

২. মিনির বাবার মনে একটু ব্যথা বোধ হয়েছিল কেন?

- |                                      |
|--------------------------------------|
| ক. মিনি স্বস্তির বাড়ি যাচ্ছে বলে    |
| খ. রহমতকে কারাগারে যেতে দেখে         |
| গ. মিনির সাথে রহমতের দেখা না হওয়ায় |
| ঘ. রহমতের মেয়ের কথা ভেবে            |

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

ফাতেমা চৌধুরী অফিসে যাওয়ার পথে প্রায়ই একটি পথশিশুকে রাস্তায় শুয়ে থাকতে দেখেন। একদিন তিনি ছেলেটিকে কিছু খাবার দিতে চাইলে সে ভয়ে পালিয়ে যায়। কয়েকদিনের চেষ্টায় ছেলেটি তার সাথে নানা গল্পে মেতে ওঠে। এখন প্রায়দিনই তিনি ছেলেটির জন্য বাসায় তৈরি খাবার নিয়ে আসেন। কখনো তার দেখা না পেলে খুব চিন্তিত হয়ে ওঠেন।

৩. উদ্দীপকের ফাতেমা চৌধুরীর সাথে ‘কাবুলিওয়ালা’ গল্পের কোন চরিত্রের মিল আছে?

- |         |             |
|---------|-------------|
| ক. রহমত | খ. রামদয়াল |
| গ. লেখক | ঘ. মিনি     |



৪. উদ্দীপকে ‘কাবুলিওয়ালা’ গল্পের কোন দিকটি ফুটে ওঠেছে?

- i. সন্তান-বাৎসল্য
- ii. সহমর্মিতা
- iii. সহযোগিতা

নিচের কোনটি সঠিক?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

**উদ্দীপক-১ :** নতুন দারোয়ান সামাদ মিয়ার সাথে ছেলের বেশি ভাব-বন্ধুত্ব কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না আবীরের মা। তিনি স্বামীকে বোঝান— বিভিন্ন ফন্দি করে অনেক মানুষ এখন অন্যের বাচ্চা চুরি করে। সামাদ মিয়াও তো একদিন তেমন কিছু করে বসতে পারে।

**উদ্দীপক-২ :** বারো বছর আগের ছোট্ট আবীর আজ কলেজ থেকে ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় হাসপাতালে। রক্তের জন্য বাবা-মা বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ করছেন। খবর পেয়ে সামাদ মিয়া ছুটে এসে হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলেন – ‘সাহেব, আবীর বাবার জন্য আমার সব রক্ত নেন, আমার নিজের ছেলেরে হারাইছি, ওরে হারাইলে আমি বাঁচুম না।’

- ক. কাবুলিওয়ালার মলিন কাগজটিতে কী ছিল?
- খ. ‘আমিতো সওদা করিতে আসি না।’ – কথাটি বুঝিয়ে লেখ।
- গ. উদ্দীপক-১ অংশে ‘কাবুলিওয়ালা’ গল্পের কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে – ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. ‘উদ্দীপকের সামাদ মিয়া যেন কাবুলিওয়ালা গল্পের মূল ভাবকেই ধারণ করে আছে।’ – বিশ্লেষণ কর।